শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবত

প্রথম স্কন্ধ

"সৃষ্টি"

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ভগবৎ ধর্মের আদর্শ প্রচারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী,
মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি
SRIMAD BHAGABATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক : শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

ঋষিদের প্রশ্ন

শ্লোক ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

ওঁ—হে ভগবান; নমঃ—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; ভগবতে— পরমেশ্বর ভগবানকে; বাসুদেবায়—(বসুদেবের পুত্র) বাসুদেবকে, অথবা আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে; জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; অস্য—প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের; যতঃ—যাঁর থেকে; অন্বয়াৎ—সরাসরিভাবে; ইতরতঃ—ব্যতিরেকভাবে; চ—এবং; অর্থেষু—অর্থসমূহ; অভিজ্ঞঃ—সম্পূর্ণরূপে অবগত; স্বরাট্—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; তেনে—প্রকাশ করেছিলেন; ব্রহ্ম—বৈদিক জ্ঞান; হৃদা—হৃদয়ের বুদ্ধিবৃত্তি; য—যিনি; আদিকবয়ে—ব্রহ্মাকে; মুহ্যন্তি—মোহাচ্ছন্ন; যৎ—যার সম্বন্ধে; সূরয়ঃ—মহান্ ঋষিরা এবং দেবতারা; তেজঃ—অগ্নি; বারি—জল; মৃদাং—মাটি; যথা—যেভাবে; বিনিময়ঃ—পরস্পর মিশ্রণ; যত্র—যার ফলে; ত্রিসর্গঃ—প্রকৃতির তিনটি গুণ; অমৃষা—সত্যবৎ; ধাম্না—সমস্ত অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য সহ; স্বেন—স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে; সদা—সব সময়; নিরস্ত—নিবৃত্ত; কুহকম্—কুহক; সত্যম্—সত্য; পরম্—পরম; ধীমহি—আমি ধ্যান করি।

অনুবাদ

হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং

পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান্ ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয়, অথবা জলে মাটি দর্শন হয়। তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তা অলীক হলেও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

তাৎপর্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই বন্দনার মাধ্যমে বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণতি নিবেদন করা হচ্ছে। এই তত্ত্ব এই গ্রন্থে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এখানে শ্রীল ব্যাসদেব ঘোষণা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ—পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সব কিছুই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁরই প্রকাশ। এই বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণসন্দর্ভ* নামক গ্রন্থে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর রচিত *ব্রহ্ম-সংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। *সামবেদেও* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর দিব্য পুত্র। তাই এই প্রার্থনায়, প্রথমেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে যদি কোন অপ্রাকৃত নামের দ্বারা সম্বোধন করতে হয়, তা হলে তা হচ্ছে কৃষ্ণ, অর্থাৎ সর্বাকর্ষক। *ভগবদ্গীতায়* বহু স্থানে তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছেন, এবং তা অর্জুন সত্য বলে সমর্থন করেছেন, এবং নারদ, ব্যাস প্রমুখ সমস্ত মহর্ষিরাও তা নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করেছেন। *পদ্মপুরাণেও* বলা হয়েছে যে, ভগবানের অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামটিই হচ্ছে মুখ্য। বাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশ, এবং বাসুদেব-সদৃশ ভগবানের অন্য সমস্ত রূপেরও উল্লেখ এই শ্লোকে করা হয়েছে। বাসুদেব নামটি বিশেষভাবে বসুদেব এবং দেবকীর দিব্য-সন্তানকেই বোঝায়। পরমহংসেরা, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন।

বাসুদেব, অথবা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। সব কিছু তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। কিভাবে যে সব কিছু তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়, তা এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতকে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অমল পুরাণ* বলে বর্ণনা করেছেন, কেননা এতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ইতিহাসও অত্যন্ত

মহিমান্বিত। মহামুনি বেদব্যাস যখন পরিপক্করূপে দিব্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তখন তিনি এই গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ব্যাসদেব *চতুর্বেদ, বেদান্ত-সূত্র* (অথবা ব্রহ্মসূত্র), *পুরাণ, মহাভারত* ইত্যাদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদ তাঁর সেই অসন্তুষ্টি দর্শন করে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বর্ণনা করতে। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বিশেষভাবে এই গ্রন্থের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই মূল বস্তুটিতে প্রবেশ করতে হলে ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর জ্ঞান লাভ করে অগ্রসর হতে হয়।

চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। রাত্রিবেলায় অগণিত তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সেখানে কি জীব রয়েছে? এই ধরনের প্রশ্নগুলি মানুষের পক্ষে করা স্বাভাবিক, কেননা, মানুষের চেতনা পশুদের চেতনা থেকে অনেক উন্নত। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরিভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস। তিনি কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডেরই স্রষ্টা নন, তিনি তার ধ্বংসকর্তাও। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এক বিশেষ সময়ে এই জড়া প্রকৃতির প্রকাশ হয়। কিছুকালের জন্য তার স্থিতি হয়, এবং তারপর তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তার বিনাশ হয়। তাই, এই জগতের সমস্ত কার্যকলাপের পেছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা। নাস্তিকেরা অবশ্য বিশ্বাস করে না যে, একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, কিন্তু সেটি তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। যেমন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, এবং এই উপগ্রহগুলি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মহাশূন্যে কিছুকালের জন্য ভাসছে। তেমনই, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বোত্তম। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই হচ্ছে এক-একটি চেতন সত্তা। অন্য সমস্ত জীবের মতো তারও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, অথবা পরম চৈতন্য হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, এবং তিনি অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। একটি মানুষের মস্তিষ্ক যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করতে পারে, তা হলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষের থেকে উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যিনি, তিনি তার থেকে অনেক আশ্চর্যজনক এবং অনেক উন্নত বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন। সুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ সহজেই এই যুক্তিটি মেনে নেবেন, কিন্তু অনেক একগুঁয়ে নাস্তিক রয়েছে, যারা তা স্বীকার করতে চায় না। শ্রীল ব্যাসদেব কিন্তু সেই পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পুরুষকে পরমেশ্বররূপে স্বীকার করেছেন। তিনি সেই পরম বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন পুরুষকে পরমেশ্বর বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি

নিবেদন করেছেন। সেই পরমেশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যা ব্যাসদেব প্রণীত *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তাঁর থেকে মহৎ বা পরমতত্ত্ব আর কিছু নেই। তাই শ্রীল ব্যাসদেব সেই পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ আরাধনা করেছেন, যাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

বিকৃত মনোভাবাপন্ন অসৎ মানুষেরা সরাসরিভাবে দশম স্কন্ধে প্রবেশ করতে চায়, বিশেষ করে দশম স্কন্ধের সেই পাঁচটি অধ্যায়ে যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের রাসলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অংশটি হচ্ছে সব চাইতে গোপনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হচ্ছেন, ততক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের রাসলীলা নামক পরম শ্রদ্ধেয় লীলাবিলাসের তত্ত্ব এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কখনই সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সর্বোচ্চ বিষয় এবং যে সমস্ত মুক্ত পুরুষ ধীরে ধীরে পরমহংস স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই রাসলীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীল ব্যাসদেব তাই পাঠককে ধীরে ধীরে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে অবশেষে ভগবানের এই লীলাবিলাসের মাধুর্য আস্বাদন করার সুযোগ দান করেছেন। তাই তিনি 'ধীমহি' কথাটির মাধ্যমে গায়ত্রী মন্ত্রের আবাহন করেছেন। এই গায়ত্রী মন্ত্র পারমার্থিক প্রগতিসম্পন্ন মানুষদের জন্য। কেউ যখন যথাযথভাবে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তাই গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে হয় অথবা যথার্থভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হয়, এবং তখনই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তিসম্ভূত তাঁর স্বরূপের বর্ণনা এবং তাঁর এই অন্তরঙ্গা শক্তি, আমাদের গোচরীভূত এই জড় জগতকে প্রকাশিত করেছেন যে বহিরঙ্গা শক্তি, তা থেকে ভিন্ন। শ্রীল ব্যাসদেব এই শ্লোকে এই দুইয়ের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নিরূপণ করেছেন। শ্রীল ব্যাসদেব এখানে বলেছেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ নিত্য, কিন্তু জড় জগতের প্রকাশকারী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মরুভূমির বুকে মরীচিকার মতো ক্ষণস্থায়ী এবং অলীক। মরুভূমির বুকে যে মরীচিকা দেখা যায়, তাতে প্রকৃতপক্ষে জল নেই। সেখানে কেবল জলের আভাস রয়েছে। প্রকৃত জল অন্য কোথাও রয়েছে। এই জড় সৃষ্টিকে বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র। পরম সত্য রয়েছে অপ্রাকৃত জগতে, এই জড় জগতে তার প্রকাশ নেই। এই জড় জগতে সব কিছুই হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ এখানে সত্য অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে রয়েছে। এই জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয় প্রকৃতির তিনটি গুণের সমন্বয়ের ফলে, এবং এই ক্ষণস্থায়ী

সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবের মোহাচ্ছন্ন চিত্তে বাস্তবের কুহক সৃষ্টি করা, এবং তার ফলে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতারাও পর্যন্ত মুহ্যমান হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে বাস্তব বলে কিছু নেই। এই জড় জগতকে বাস্তব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বস্তু হচ্ছে চিন্ময় জগৎ, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পার্ষদ সহ নিত্য বিরাজ করেন।

কোন জটিল কলকব্জার নির্মাতা যে মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার, তিনি কখনও সরাসরিভাবে সেটি তৈরির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন না, তবুও তিনি তার প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, কেননা সব কিছু তারই পরিচালনায় সম্পাদিত হয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সেটি তৈরির ব্যাপারে সব কিছু জানেন। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের পরম সৃষ্টিকর্তা, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত, যদিও এখানকার কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় স্বর্গের দেব-দেবীদের মাধ্যমে। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত কেউই স্বাধীন নয়। ভগবানের প্রভাব সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত জড় বস্তু এবং চিৎ-স্ফুলিঙ্গ তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়। জড় এবং চেতন, এই দুটি শক্তির সমন্বয়ের ফলেই এই জড় জগতে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, এবং দুটি শক্তিই, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোন রসায়নবিদ রসায়নাগারে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন ঘটিয়ে জল তৈরি করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসায়নবিদ রসায়নাগারে যে কর্ম করছে, তা পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় সম্পাদিত হচ্ছে এবং যে সমস্ত উপাদান নিয়ে তারা কাজ করছে, সে সবই সরবরাহ করছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত, এবং অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধেও তিনি অভিজ্ঞ এবং তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ভগবানকে একটি স্বর্ণখনির সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর এই জড় জগতের সৃষ্ট সব কিছুকে আংটি, হার ইত্যাদি স্বর্ণনির্মিত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। আংটি, হার ইত্যাদি বস্তুগুলিও গুণগতভাবে স্বর্ণখনির সমস্ত স্বর্ণের সঙ্গে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে স্বর্ণখনিগুলি স্বর্ণ থেকে ভিন্ন। তেমনই পরমতত্ত্বও যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। কোন কিছুই পরম সত্যের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তবুও কোন কিছুই পরমতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র নয়।

এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবেরাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করছে, কিন্তু তারা কেউই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র নয়। জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, তারাই হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। একে বলা হয় মায়া অথবা মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। জ্ঞানের অভাবের ফলেই জড়বাদীরা তাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না, এবং তাই তারা মনে করে যে, উন্নত বুদ্ধিমত্তা ব্যতীত আপনা থেকেই জড় জগতের প্রকাশ হয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীল ব্যাসদেব তাদের সেই নির্বোধ মতবাদকে খণ্ডন

করেছেন: "যেহেতু সেই পূর্ণ বস্তু অথবা পরম সত্য হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই কোন কিছুই সেই পরম সত্য থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না।" দেহে যা কিছু ঘটে দেহী তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারে। তেমনই এই সৃষ্টি হচ্ছে সেই পূর্ণ বস্তুর দেহ। তাই এই সৃষ্টিতে যা কিছু হচ্ছে সে সম্বন্ধে পূর্ণ পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবগত।

শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ণ বস্তু অথবা ব্রহ্ম হচ্ছে সব কিছুরই পরম উৎস। সব কিছু তাঁর থেকেই প্রকাশিত হয়, এবং সব কিছুই তাঁর দ্বারা প্রতিপালিত হয়, এবং অবশেষে সব কিছুই তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। স্মৃতি মন্ত্রেও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের শুরু থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে অবশেষে সব কিছু প্রবিষ্ট হবে, সে সবেরই উৎস হচ্ছেন পরম সত্য বা ব্রহ্ম। জড় বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, সূর্য হচ্ছে গ্রহমণ্ডলীর উৎস, কিন্তু সূর্যের উৎস যে কি তা বিশ্লেষণ করতে তাঁরা অক্ষম। এখানে সব কিছুর পরম উৎস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, ব্রহ্মা, যাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, তিনি পরম স্রষ্টা নন। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে,পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। এই সম্বন্ধে কেউ তর্ক করতে পারে যে, যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম সৃষ্ট জীব, তাই অন্য কেউই তাঁকে জ্ঞান দান করতে পারে না, কেন না সে সময় আর অন্য কোনও জীব ছিল না। কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে গৌণ স্রষ্টা ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞান দান করেছিলেন যাতে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করতে পারেন। তাই সমস্ত সৃষ্টির পিছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বুদ্ধিমত্তা। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনিই সৃষ্টিশক্তি, প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, যা হচ্ছে পূর্ণ জড় সৃষ্টির মূল আধার। তাই শ্রীল ব্যাসদেব ব্রহ্মার বন্দনা না করে পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করেছেন, যিনি সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মাকে পরিচালিত করেন। এই শ্লোকে 'অভিজ্ঞ' এবং 'স্বরাট' শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দ দুটি অন্য সমস্ত জীব থেকে পরমেশ্বর ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। অন্য কোনও জীবই 'অভিজ্ঞ' অথবা 'স্বরাট' নয়। অর্থাৎ কেউই সম্পূর্ণরূপে সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় অথবা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নয়। ব্রহ্মাকেও সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে হয়েছিল। তা হলে আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিকদের কি কথা! এ ধরনের বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক অবশ্যই কোন মানুষ সৃষ্টি করেনি। কোন বৈজ্ঞানিক এই ধরনের মস্তিষ্ক তৈরি করতে পারে না, সুতরাং যে সমস্ত গণ্ডমূর্খ নাস্তিক ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাদের কি কথা? যে সমস্ত মায়াবাদী (নির্বিশেষবাদী) পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তারাও অভিজ্ঞ অথবা স্বরাট নয়। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরাও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করবার জন্য বহু তপস্যা করে, কিন্তু অবশেষে তারা তাদের যে সমস্ত ধনী শিষ্য তাদের টাকা সরবরাহ করে এবং মন্দির বানিয়ে দেয় তাদের হুকুমের গোলামে

পরিণত হয়। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রমুখ নাস্তিকদের ভগবানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে ভগবান যখন নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন তারা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়েছিল। আধুনিক যুগের যে সমস্ত নাস্তিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাদেরও সেই একই অবস্থা হবে। এই ধরনের নাস্তিকদেরও ঠিক তেমনভাবেই দণ্ডভোগ করতে হবে, কেন না ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে। মানুষ যখনই পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তা অস্বীকার করে তখন প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়ম তাদের দণ্ডদান করে। সে কথা *ভগবদ্গীতায়* অতি প্রসিদ্ধ শ্লোক *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ* শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ "যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের বিস্তার হয়, হে অর্জুন, তখন আমি অবতরণ করি।" (ভগবদ্গীতা ৪/৭)

পরমেশ্বর ভগবান যে সম্যকভাবে পূর্ণ সেকথা সমস্ত শ্রুতি মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে সর্বতোভাবে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন এবং তার ফলে জড় জগতের প্রাণের সঞ্চার হয়ে সৃষ্টি শুরু হয়। জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তিনি তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে চেতনের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ জীবদের প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চারিত করেন, এবং তার ফলে তাঁর সৃষ্টিশক্তি কার্যকরী হয়ে অপূর্ব সুন্দর সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ করে। একজন নাস্তিক তর্ক করতে পারে যে ভগবান একজন ঘড়ি-নির্মাতার চেয়ে অভিজ্ঞ নন, কিন্তু ভগবান তাঁর সৃষ্টি থেকে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি স্ত্রী এবং পুরুষ রূপী দুটি যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন এবং এই যন্ত্র দুটির মাধ্যমে সেরকম অসংখ্য যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারেন। কোন মানুষ যদি এমন কোন যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারে যা তার সাহায্য বা অভিনিবেশ ছাড়াই সেরকম যন্ত্র তৈরি করতে পারে, তা হলে সে ভগবানের বুদ্ধিমত্তার ধারে কাছে যেতে পারে। কিন্তু সেটি সম্ভব নয়, কেন না মানুষের তৈরি কোন যন্ত্রই স্বতন্ত্রভাবে কার্যকরী হতে পারে না। তাই কেউই ভগবানের মত সৃষ্টি করতে পারে না। ভগবানের আর একটি নাম হচ্ছে অসমোর্ধ্ব, অর্থাৎ তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই। পরম সত্য হচ্ছেন তিনিই, যাঁর সমকক্ষ অথবা যাঁর থেকে মহৎ কেউই হতে পারে না। সে কথা শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে কেবল ভগবানই ছিলেন, যিনি হচ্ছেন সকলেরই প্রভু। ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই ভগবানের সমস্ত নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করা উচিত। কেউ যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। সে কথা ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করছে, ততক্ষণ তাকে মোহাচ্ছন্ন থাকতেই হবে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন এবং সম্পূর্ণভাবে অবগত হন যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, যে কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে,

তখন সেই অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ মহাত্মায় পর্যবসিত হন। তবে এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। মহাত্মারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত সৃষ্টির পরম কারণ রূপে জানতে পারেন। তিনিই পরম অথবা চরম সত্য, কেন না আর সমস্ত সত্যই তাঁর উপরে নির্ভর করে বিরাজ করে। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি কখনই মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না।

কোন কোন মায়াবাদী পণ্ডিত তর্ক করে যে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেননি, এবং তাদের কেউ কেউ বলে যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বোপদেব নামক জনৈক ব্যক্তির রচিত একটি আধুনিক গ্রন্থ। এই ধরনের মতামতগুলি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। শ্রীধর স্বামী দেখিয়ে গেছেন যে বহু প্রাচীন পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। সবচাইতে প্রাচীন পুরাণ মৎস্য পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। এই পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হয়েছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে এবং তাতে বহু পারমার্থিক নির্দেশের বর্ণনা রয়েছে। তাতে বৃত্রাসুরের ইতিহাস রয়েছে। পূর্ণিমার দিনে এই গ্রন্থটি কাউকে দান করলে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। অন্যান্য পুরাণেও শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থটি ১২টি স্কন্ধে সমাপ্ত হয়েছে, এবং তাতে ১৮,০০০ শ্লোক রয়েছে। পদ্ম পুরাণেও গৌতম মুনি এবং মহারাজ অম্বরীষের আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে গৌতম মুনি মহারাজ অম্বরীষকে উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান তা হলে তিনি যেন নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের পরেও, গত ৫০০ বছর ধরে শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য প্রমুখ বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন। যাঁরা ঐকান্তিকভাবে জ্ঞানের অন্বেষী তাঁরা যেন আরও গভীরভাবে দিব্য জ্ঞান আস্বাদন করার জন্য সেই সমস্ত ভাষ্য পাঠ করার চেষ্টা করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড় কামোন্মত্ততা-রহিত আদি রসের আলোচনা করেছেন। সমস্ত জড় সৃষ্টিই কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক যুগে কামই হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের মূল অনুপ্রেরণা। যেদিকেই তাকানো যায় দেখা যায় যৌন আবেদনের হাতছানি। সুতরাং এই যৌন আবেদন অবাস্তব নয়। তবে তার যথার্থ প্রকাশ হচ্ছে চিৎ জগতে—ভগবদ্ধামে। এই জড় জগতের যৌন জীবন হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন। বাস্তব বস্তু হচ্ছে পরম সত্য, এবং তাই পরম সত্য কখনই নির্বিশেষ হতে পারে না। নির্বিশেষ বা নিরাকার কোন কিছুর পক্ষে বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন করা সম্ভব হতে পারে না। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু পরম সত্যে নির্বিশেষত্ব আরোপ করেছে তাই তারা অতি ঘৃণ্য যৌন জীবনের প্রতি

পরোক্ষভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। যে মানুষের অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, তারা ভগবৎ-প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন কাম বা যৌন আবেদনকেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে। এই জড় জগতের বিকৃত যৌন জীবনের সঙ্গে অপ্রাকৃত জগতের বিশুদ্ধ প্রেমের আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

এই শ্রীমদ্ভাগবত ধীরে ধীরে নিরপেক্ষ পাঠককে পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। এই গ্রন্থ মানুষকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত কার্যকলাপ—সকাম কর্ম, জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত জ্ঞান এবং আনুষ্ঠানিক উপাসনার স্তর অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

শ্লোক ২

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥

ধর্ম—ধর্ম; **প্রোজ্‌ঝিত**—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; **কৈতবঃ**—ভুক্তিমুক্তি বাসনা যুক্ত; **অত্র**—এখানে; **পরমঃ**—সর্বোচ্চ; **নির্মৎসরাণাম্**—যাঁর হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; **সতাম্**—ভক্ত; **বেদ্যম্**—বোধগম্য; **বাস্তবম্**—বাস্তব; **অত্র**—এখানে; **বস্তু**—বস্তু; **শিবদম্**—পরমানন্দদায়ক; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ; **উন্মূলনম্**—সমূলে উৎপাটিত করে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **ভাগবতে**—ভাগবত পুরাণ; **মহামুনি**—মহামুনি (ব্যাসদেব); **কৃতে**—রচিত; **কিম্**—কি; **বা**—প্রয়োজন; **পরৈঃ**—অন্য কিছু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সদ্যঃ**—অবিলম্বে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবরুধ্যতে**—অবরুদ্ধ হয়; **অত্র**—এখানে; **কৃতিভিঃ**—সুকৃতি সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **শুশ্রূষুভিঃ**—অনুশীলনের ফলে; **তৎ-ক্ষণাৎ**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু; সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ব অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ধর্মের অন্তর্গত চারটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে—পুণ্যকর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি। ধর্মবিহীন জীবন হচ্ছে অসভ্য জীবন। ধর্ম আচরণ শুরু হলেই কেবল যথার্থ মানব জীবনের শুরু হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন এই চারটি হচ্ছে পশু জীবনের ভিত্তি। এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষ এবং পশু উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু ধর্ম আচরণ হচ্ছে মানব জীবনের একটি বিশেষ কার্য। ধর্মবিহীন মনুষ্য জীবন পশুজীবনের থেকে কোন অংশেই উন্নত নয়। তাই মানব সমাজে ধর্ম-অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া।

মানব সভ্যতার নিম্ন স্তরে সব সময়ই জড় জগতকে ভোগ করার তীব্র বাসনা থাকে এবং তার ফলে নিরন্তর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই ধরনের চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত হতে হতে অবশেষে ধর্মের প্রতি উন্মুখ হয়। সে তখন জড় সুখভোগের আশায় পুণ্যকর্ম অথবা ধর্ম-অনুষ্ঠান করে। কিন্তু এই ধরনের জড় সুখভোগ যদি অন্য উপায়ে লাভ করা যায়, তখন তারা তথাকথিত সেই সমস্ত ধর্ম আচরণে অবহেলা করে। এটিই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার পরিস্থিতি। মানুষ যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে, তাই এখন আর তারা ধর্মের প্রতি ততটা উৎসাহী নয়। মন্দির, মসজিদ অথবা গির্জাগুলি এখন প্রায় শূন্যই পড়ে থাকে। মানুষ এখন তাদের পূর্ব পুরুষদের তৈরি ধর্ম-আচরণের স্থানগুলি থেকে কল-কারখানা, দোকান-বাজার এবং প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদির প্রতি অধিক উৎসাহী। এর থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই সেই ধরনের ধর্ম অনুষ্ঠান হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য। অনেক সময় দেখা যায় যে কেউ যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়, তখন সে মোক্ষলাভের চেষ্টা করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলিও ইন্দ্রিয় সুখভোগেরই নামান্তর।

বেদে এই চারটি কর্মেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ যথাযথভাবে তাদের জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য পরস্পরের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা না হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্যকলাপের অতীত এক দিব্য শাস্ত্র। এটি হচ্ছে পূর্ণরূপে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত একটি গ্রন্থ, যা কেবল জড় ভোগ-বাসনা রহিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। জড় জগতের মানুষে মানুষে, পশুতে-পশুতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে নিরন্তর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। কিন্তু ভগবানের ভক্তরা এই ধরনের প্রতিযোগিতার অতীত। তাঁরা জড়বাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন না, কেন না তাঁরা ভগবদ্ধামের দিকে এগিয়ে চলেছেন, যেখানে জীবন নিত্য